তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প

(গল্পগ্রন্থ – জন্ম ও মৃত্যু)

সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই। রাস্তায় পুরোনো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল, এই যে, এখানে কি? চলচল জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোননি? মস্ত বড় গুণী।

হাত দেখানোর ঝোঁক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভালোজ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কি? যা বলে তা সত্যি হয়?আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে? দু-টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখ না বলতে পারে কি না। কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ির গায়ে টিনের সাইনবোর্ডে লেখা আছে—তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ—

এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠীবিচার করা হয়। গ্রহশান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি।

আসুন ও দেখিয়া বিচার করুন।

বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। দর্শনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ি।

হাসিয়া বলিলাম—লোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার ভক্ত, তার এই বাড়ি?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষী-মশায় বাড়ি আছেন?

ভিতর হইতে খানিকক্ষণ কোন উত্তর শোনা গেল না। তারপর দরজা খুলিয়া গেল।একটা ছোট ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়াজিজ্ঞাসা করিল কোথা থেকে আসছেন?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণকাহারও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখছি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ করে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েচে আমরা পাওনাদার কি না দেখতে। এবার ডেকে নিয়ে যাবে। আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল, আসুন ভেতরে।

ছোট একটা ঘরে তক্তাপোশের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজাঠেলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাতজোড় করিয়া প্রণামকরিয়া বলিল—পণ্ডিতমশায় আসুন।

বৃদ্ধের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশি হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ-বয়সেও গায়েররঙের জৌলুস আছে। মাথায় চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধূর্ততা ওবুদ্ধিমত্তা মেশানো, নিচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তাব্যঞ্জক। চোখ দুটি বড় বড়, উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল—উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশি। আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিস্ফুট। অর্থাৎ যতটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিলেন, এখন তাহার যেন অনেকখানিই হারাইয়া গিয়াছে, এই ধরনের একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃদ্ধ নিবিষ্টমনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনেরই শ্রাবণ, তের-শ পাঁচ সাল। ঠিক? আপনার বিবাহ হয়েছে তের-শ সাতাশ সাল, ঐ পনেরই শ্রাবণ। ঠিক? জন্মমাসে বিয়ে তো হয় না, আপনার হল কেমন করে, এরকম তো দেখিনি। কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ করিয়া আমার দিনটা মনে ছিল এইজন্য যে, আমার জন্মদিন ও বিবাহের দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ

একটু গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, সেআমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তার সঙ্গে আলাপমোটে দু-বছরের, তাও এক ব্রিজ খেলার আড্ডায়, সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্তারকোন অবকাশ ছিল না।

তারপর বৃদ্ধ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীরবর্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মস্ত বড় ফাঁড়া গিয়েছিল, তেরো বছর বয়সে। কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎতারানাথ বলিল—বর্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্থনষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না, বরং আরও কিছু ক্ষতিযোগ আছে। আমি আশ্চর্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম। মাত্র দু'দিন আগে কলুটোলা স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোটসুদ্ধ মানিব্যাগটি খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেওপ্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধ হয় থট্-রীডিং জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে? এটুকু বোধ হয় ধাপ্পা। যাই হোক, সাধারণ হাতদেখা গণকের মতো মন বুঝিয়া শুধুমিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে না।

আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। মাঝে মাঝে তার ওখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যাইতাম তাহা নয়, প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে।

লোকটার বড় অদ্ভুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতেবেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁর কাছে কিছুদিন তন্ত্রসাধন করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাঙাইয়া খাইতে শুরুকরিল।

শেয়ার মার্কেট, ঘোড়দৌড়, ফাট্কা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে, বড় বড় মারোয়াড়ীর মোটরগাড়ির ভিড়ে শনিবারসকালে তার বাড়ির গলি আটকাইয়া থাকিত—পয়সা আসিতে শুরু করিল অজস্র। যে-পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি পয়সাও দাঁড়াইল না।

তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল— ঘোড়দৌড়, নারী ও সুরা। এই তিনদেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর দুলাল যথাসর্বস্ব আহুতি দিয়া পথের ফকিরসাজিয়াছে, তারানাথ তো সামান্য গণৎকার ব্রাহ্মণ মাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরেতারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্পূরের ন্যায়উবিয়া গেল, এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল।ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকার পসার নষ্ট হইল। তবুও ধূর্ত, ফন্দিবাজি, ব্যবসাদারি প্রভৃতি মহৎ গুণরাজির কোনটিরই অভাব তারানাথের চরিত্রে না থাকাতে, সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু বর্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তারানাথেরদিবসের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা কই?

আমার মতো গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পসার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই, একথাখুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপরে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমার সহিত তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে, তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিষ্য করে রেখেযাব, লোকে দেখবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কি না। লোক পাইনি এতকালযে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল—চন্দ্রদর্শন করতে চাও? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতেরআঙুলে দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কান জোর করে চেপে চিতহয়ে শুয়ে থাক। কিছুদিন অভ্যেস করলেই চন্দ্রদর্শন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আরনিচে একটা গাছের তলায়

দুটি পরী। তুমিযা জানতে চাইবে, পরীরা তাই বলে দেবে। ভালো করে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যেস করেছে, তার অজানা কিছু থাকে না।

চন্দ্রদর্শন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম। লোকটা এমন সবঅদ্ভুত কথা বলে যা পথে-ঘাটে বড় একটা শোনা তো যায়ই না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তার তো কোনদিন জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুরাতন একখানা তুলোট কাগজের পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—'চল বেলেঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন দেখা করে আসি। খুব ভালো তান্ত্রিক শুনেছি।' তারানাথের স্বভাবই ভালো সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ানো—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি আবার তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব কর্ম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত লাগিয়া থাকিবে।

গেলাম বেলেঘাটা। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম, তিনি আমাকে যে-কোন একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেলফুলের নাম করিতেই তিনি বলিলেন—পকেটে রুমাল আছে? বার করে দেখ!

রুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভুরভুর করিতেছে। আমি সাধুরনিকট হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, রুমালখানাতে আমার নামও লেখা—সুতরাং হাত-সাফাইয়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই।

কিছু যে আশ্চর্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধুবাবাজী তান্ত্রিকশক্তির সাহায্যেই আমার রুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও এত কষ্ট করিয়াতন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরি করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোনমূল্য দিই না। আতর তো বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়।

ফিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ,লোকটা নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রসাধনা করেচে, তারই ফলে দু-একটা সামান্য শক্তি পেয়েচে।

তাই বা পায় কি করিয়া? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেও তোঅনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, মুহূর্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমার রুমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল—তাহার পিছনেও তো একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে, contact at a distance-এর মোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপ্‌নটিজ্‌ম, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার উপর ততক্ষণ কার্যকরী হইতে পারে, যতক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরেও আমার উপর যে হিপ্‌নটিজমের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সে প্রভাবের মূলে কি আছে, সেও তো আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বাড়িতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এইদেখেই দেখচি আশ্চর্য হয়ে পড়লে, তবুও তো সত্যিকার তান্ত্রিক দেখনি। নিম্নশ্রেণীর তন্ত্র এক ধরনের জাদু, যাকে তোমরা বললো ব্ল্যাকম্যাজিক। এক সময়ে আমিও ও-জিনিসের চর্চা যে না করেচি তা নয়। ও আতরের গন্ধ আর এমন একটা কি, এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি, শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না। একজনকেজানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এ-ধরনেরলোক দেখেচ। সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জিভেএকটু দাগও লাগল না। এসব নিম্ন ধরনের তন্ত্রচর্চার শক্তি, ব্লাকম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়।এর চেয়েও অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেচি।

কি হল জান? ছেলেবেলায় আমাদের দেশ বাঁকুড়াতে এক নামকরা সাধু ছিলেন। আমার এক খুড়ীমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদেরবাড়ি প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন, আমাদের বাড়ি এলেইআমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায় বলতেন—দুই চোখেরমাঝখানে ভুরুতে একটা জ্যোতি আছে, ভালো করে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি। খুবএকমনে চেয়ে দেখিস। মাস দুই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হল।

মনে ভাবলাম—চন্দ্রদর্শনের মতো নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ধরনেরজ্যোতি?

—ঠিক নীল বিদ্যুৎশিখার মতো। প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে—বাড়ির পিছনে পেয়ারাতলায় বসে সাধুর কথামতো নাকের উপরদিকে ঘণ্টাখানেক চেয়ে থাকতাম,—সব দিন ঘটে উঠ্‌ত না, হপ্তার মধ্যে দু-তিন দিন বসতাম। মাস তিনেক পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হল নীল, লিক্‌লিকে একটা শিখা, আমার কপালেরমাঝখানে ঠিক সামনে খুব স্থির মিনিটখানেক ছিল প্রথম দিন।

এইভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়িতে আর মন টেকে না, ঠাকুরমার বাক্স ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়েগেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

একদিন অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়নি, মন্দিরে মন্দিরে আরতি চলেচে, এমন সময় একজন লম্বা-চওড়া চেহারার সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমণ্ডলু হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তাঁর সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না, সাধু তো কতই দেখি। চুপকরে আছি, সাধুবাবাজী জল ভরে পৈঠা বেয়ে উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে খাসাবাংলায় বললেন—বাবাজীর বাড়ি কোথায়?

আমি বল্‌লাম, বাঁকুড়া জেলায় মালিয়াড়া-রুদ্রপুর।

সাধু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—মালিয়াড়া-রুদ্রপুর? তারপর কি যেন একটাভাবলেন, খুব অল্পক্ষণ, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন— রুদ্রপুরের রামরূপ সান্যালের নাম শুনেচ? তাদের বংশে এখন কে আছে জান?

আমাদের গ্রামে সান্যালেরা এক সময়ে খুব অবস্থাপন্ন ছিল, খুব বড় বাড়ি-ঘর, দরজায় হাতি বাঁধা থাকতো শুনেচি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তুরামরূপ সান্যালের নাম তো কখনও শুনিনি! সন্ন্যাসীকে সম্ভ্রমে সে কথা বলতে তিনিহেসে বললেন—তোমার বয়েস আর কতটুকু! তুমি জানবে কি করে! খেয়াঘাটেরকাছে শিবমন্দিরটা আছে তো?

খেয়াঘাট! রুদ্রপুরে নদীই নেই, মজে গিয়েচে কোন্‌কালে, এখন তার ওপর দিয়েমানুষ গরু হেঁটে চলে যায়। তবু পুরোনো নদীর খাতের ধারে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে। শুনেছি সান্যালদেরই কোন্ পূর্বপুরুষ ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি করে জানলেন?

বিস্ময়ের সুরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা অনেক জানেন দেখচি?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধপিতামহের মুখে দেখা যায়, তার অতি তরুণ, অবোধ পৌত্রের কোন ছেলেমানুষি কথার জন্য। সত্যি বলচি, সে হাসিরস্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারিনি, খুব উঁচু না হলে অমন হাসি মানুষ হাসতে পারে না।তারপর খুব শান্ত সস্নেহ কৌতুকের সুরে বললেন—বাড়ি থেকে বেরিয়েচিস্ কেন? ধর্মকর্ম করবি বলে?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বল্‌লেন—বাড়ি ফিরে যা, সংসারধর্মকরগে যা। এপথ তোর নয়, আমার কথা শোন্।

বললাম—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না, কিছু হবে না কেন? আমার সংসারে মননেই। সংসার ছেড়েই এসেচি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িসনি, ছাড়তেপারবিওনে। তুই ছেলেমানুষ, নির্বোধ। কিছু বোঝবার বয়েস হয়নি। যা বাড়ি যা। মা-বাপের মনে কষ্ট দিস নে।

কথা শেষ করে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়েরকথা কি করে জানলেন বলবেন না? দয়া করে বলুন—

তিনি কোন কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তার পিছু নিলাম। খানিক দূর গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আমাকেবললেন—কেন আসছিস্?

—আপনাকে ছাড়ব না। আমি কিছু চাই নে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি সস্নেহে বললেন—আমার সঙ্গে এলে তোর কোন লাভ হবে না। তোকে সংসার করতেই হবে। তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার। যা চলে যা—তোকে আশীর্বাদ করচি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তার অনুসরণ করতে, কি একটা শক্তি আমার ইচ্ছাসত্ত্বেওযেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনেরদিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন্ গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েচেন বা কোন্‌দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে এসে দেশের খুব বৃদ্ধ লোকদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্যালের কোন হদিস মেলাতে পারলাম না। সান্যালদেরবাড়ির ছেলে-ছোকরার দল তো কিছুই বলতে পারে না। ওদের এক শরিক জলপাইগুড়িতেডাকঘরে কাজ করতেন, তিনি পেন্সন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ি এলেন। কথায়কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বললেন—দেখ, আমার ছেলেবেলায় বড়জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা খাতা দেখেছি, তাতে আমাদের বংশের অনেক কথা লেখা ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব শখ ছিল, অনেক কষ্ট করে নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি করে বংশের কুলজী যোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেচি চার-পাঁচ পুরুষ আগে আগে আমাদেরই বংশে রামরূপ সান্যাল নদীর ধারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।রামরূপ সাধক-পুরুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তুসংসারে তিনি বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না। রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামনিধি, প্রথমযৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশেফেরেননি। অন্তত দেড়-শ বছর আগের কথা হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ শিবমন্দিরটা ও-রকম মাঠের মধ্যে বেখাপ্পা জায়গায় কেন?

—তা নয়। ওখানে তখন বহতা নদী ছিল। খুব স্রোত ছিল। বড় বড় কিস্তি চলত।কোন্ নৌকা একবার ওই মন্দিরের নিচের ঘাটে মারা পড়ে বলে ওর নাম লা-ভাঙার খেয়াঘাট।

প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলুম—খেয়াঘাট?

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেচি, বাবার মুখে শুনেছচি, তা ছাড়া আমাদের পুরোনো কাগজপত্রে আছে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লা-ভাঙার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বল তো, এসব কথা তোমার জানবার কি দরকার হল? বই-টই লিখচ নাকি?

ওদের কাছে কোনো কথা বলিনি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল এবং সে বিশ্বাসআজও আছে যে, কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই। কোন অদ্ভুতযৌগিক শক্তির বলে দেড়-শ বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ি থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরই। বীরভূমের একগ্রামে শুনলাম সেখানকার শ্মশানে এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম, নদীর ধারে শ্মশানে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়চোপড় পরনে, তেমনই মলিন জটপাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে— বেরো এখান থেকে, কে বলেচে তোকে এখানে আসতে?

ওর আলুথালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল, সেটাকে অতিকষ্টে চেপে বললাম—মা, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন, অনেক দূর থেকে এসেচি, দয়া করুন আমার ওপর।

পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বললে—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি—আঙ্গুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জন শ্মশান, ভয় হল ওর মূর্তি দেখে, কি জানি মারবে টারবে নাকি—পাগলমানুষকে বিশ্বাস নেই। সেদিন চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার পরদিন।

পাগলী বললে—আবার কেন এলি?

বললাম—মা, আমাকে দয়া কর—

পাগলী বললে—দূর হ—দূর হ, বেরো এখান থেকে—

তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাথি। বললে—ফের যদি আসিস, তবে বিপদেপড়বি, খুব সাবধান।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, না, এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। কি এক পাগলের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখচি কোন্‌দিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে চেহারাআর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখে আমায় যেন বললে—লাথিটা খুব লেগেচে, না রে?তা রাগ করিস্ নে, কাল যাস্ আমার ওখানে। সকালে উঠেই আবার গেলাম। ওমা, স্বপ্ন সব মিথ্যে, পাগলী আমায় দেখে মারমূর্তি হয়ে শ্মশানের একখানা পোড়া-কাঠআমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরিয়া হয়েচি, বললাম—তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে? তুমিই তো আসতে বললে তাই এলাম।

পাগলী খিলখিল করে হেসে উঠল—তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে। তোর মুণ্ডচিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। হি-হি-হি—যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকৃষ্ট করেচে, আমি বুঝলাম তখনি সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান করুক, আমার মনে হল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাতশক্তির বলে টানচে।

হঠাৎ সে বললে—বোস্ এখানে।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে, তার আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন খুবরাজা-জমিদারের ঘরের কর্ত্রীর মতো—তার সে হুকুম পালন না করে যে উপায় নেই।

কাজেই বসতে হল।

সে বললে—কেন এখানে এসে বিরক্ত করিস্ বল্ তো? তোর দ্বারা কি হবে, কিছুহবে না। তোর সংসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েছে। আমি চুপ করেই থাকি। খানিকটাবাদে পাগলী বললে—আচ্ছা কিছু খাবি? আমার এখানে যখন এসেচিস্, তার ওপরআবার বামুন, তখন কিছু খাওয়ানো দরকার। বল কি খাবি?

পাগলীর শক্তি কত দূর দেখবার জন্য বড় কৌতূহল হল। এর আগে লোকের মুখে শুনে এসেচি, যা চাওয়া যায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এনে দিতে পারে। কলকাতায় গন্ধ-বাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেচি, সে আমার ততটা আশ্চর্য বলে মনে হয়নি।বললাম—খাব অমৃতি জিলিপি ক্ষীরের বরফি আর মর্তমান কলা। পাগলী এক আশ্চর্যব্যাপার করলে। শ্মশানের কতকগুলো পোড়াকয়লা পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলেনিয়ে বললে—এই নে যা, ক্ষীরের বরফি—

আমি তো অবাক্! ইতস্তত করচি দেখে সে পাগলের মতো খিলখিল করে কি এক রকম অসম্বদ্ধ হাসি হেসে বললে—খা-খা—ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হ'ল এ তো দেখচি পুরো পাগল, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর কথায়মড়া পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ—কিন্তু আমার তখন আর ফেরবার পথনেই, অনেক দূর এগিয়েচি। দিলাম সেই কয়লা মুখে পুরে, যা থাকে কপালে! পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিশ্রী, বিস্বাদ চিতার কয়লার টুকরো মুখ থেকে বার করেফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেচে। কি বোকামি করেচি এখানে এসে—এ পাগলই, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, বদ্ধ উন্মাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সাধু বলে নামরটিয়েচে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললে— খেলি রাবড়ি, মর্তমান কলা? পেটুককোথাকার। পেটের জন্যে এসেচে শ্মশানে আমার কাছে? দূর হ জানোয়ার—দূর হ।

আমার ভয়ানক রাগ হল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও কেউ মুখের ওপরবলেনি। একটিও কথা না বলে আমি তখনই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবে না, আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলীকে স্বপ্নে দেখলাম, আমার শিয়রেরদিকে দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি মুখে বলচে—রাগ করিস্ নে। আসিস্ আজ, রাগ করে না, ছিঃ—

এখনও পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, না জাগ্রত অবস্থায়দেখেছিলাম?

যা হোক্, জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় জাদু করলেনাকি?

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মূর্তি ভারী প্রসন্ন। বললে—আবারএসেচিস্ দেখচি। আচ্ছা নাছোড়বান্দা তো তুই?

আমি বললাম কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমায় নিয়ে?দিনে অপমান করে বিদেয় করে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বল। এ রকম হয়রান করে তোমার লাভ কি?

পাগলী বললে—পারবি তুই? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তা করবি?

বললাম—আছে। যা বলবে তাই করব। দেখই না পরীক্ষা করে।

সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। সে বললে—আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল। গলা টিপে মেরে ফেল্। তারপর আমার মৃতদেহের ওপর বসে তোকে সাধনা করতে হবে। নিয়ম বলে দেব। বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা। মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ করে বিকট চিৎকার করে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক ঢোঁক মদ আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা দিবি। ভোররাত পর্যন্ত এমনি মড়ার ওপর বসে মন্ত্রজপ করতে হবে। রাত্রে হয়ত অনেক রকম ভয় পাবি। যারাএসে ভয় দেখাবে তারা কেউ মানুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয় কোরো না। ভয় পেলেসাধনা তো মিথ্যা হবেই, প্রাণ পর্যন্ত হারাতে পার। কেমন রাজী?

ও যে এমন কথা বলবে তা বুঝতে পারিনি। কথা শুনে তো অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, সব পারব কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না। আর তুমিই বা আমার জন্যে মরবে কেন?

পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিলি কেন মুখপোড়া, বেরো, দূর হ—

আরও নানা রকম অশ্লীল গালাগাল দিলে। ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড় খারাপ আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাখি নে, গা-সওয়া হয়েগিয়েচে। বললাম রাগ করচ কেন? একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা? আমি না ভদ্রলোকেরছেলে?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত করে বললে—ভদ্দর লোকের ছেলে! ভদ্দর লোকেরছেলে তবে এ পথে এসেছিস কেন রে, ও অলপ্পেয়ে ঘাটের মড়া? তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনাভদ্দর লোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর পরে হৌসে চাকরি করগিয়ে— বেরো—

বললাম—তুমি শুধু রাগই কর। পুলিসের হাঙ্গামার কথাটা তো ভাবচ না। আমিযখন ফাঁসি যাব, তখন ঠেকাবে কে?

মনে মনে আমার সন্দেহ হল, না এ নিতান্তই পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। এর কাছে এসেশুধুএতদিন সময় নষ্ট করেচি ছাড়া আর কিছু না।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেচি, তন্ত্রের কথা শুনেচি।সময়ে সময়ে সত্যই এমন কথা বলে যে, ওকে বিদুষী বলে সন্দেহ হয়।

সেইদিন থেকে পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হল। বিকেলে যখন গেলাম, তখনআপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে না, তোকে ওবেলাগালাগাল দিয়েচি, কিছু মনে করিস্ নে। ভালোই হয়েচে, তুই সাধনা করতে চাস্‌নি।ও সব নিম্ন-তন্ত্রের সাধনা। ওতে মানুষের কতকগুলো শক্তি লাভ হয়, তা ছাড়া আরকিছু হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয়?

পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে, তাদের চোখে দেখতে পাওয়াযায় না। মানুষ মরে দেহশূন্য হলে চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশি। এদেরও দেখা যায় না। তন্ত্রে ওদের ডাকিনী, শাঁখিনী এই সব নাম। এরা কখনওমানুষ ছিল না, মানুষ মরে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ফকিরেরাএদের জিন্ বলে। এদের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশকরা যায়। তখন যা বলা যায় এরা তাই করে। করতেই হবে, না করে উপায় নেই।কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে। অসাবধান তুমি যদি হয়েচ, তোমাকে মেরেফেলতে পারে।

অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এসব কথা আর কখনও শুনিনি। এর মতো পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনচি, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে। গ্রাম্য শ্মশান, একটা বড় তেঁতুলগাছ আর এক দিকেকতকগুলো শিমুল গাছ। দু-চার দিন আগের একটা চিতার কাঠকয়লা আর একটাকলসী জলের ধারে পড়ে রয়েচে। কোনদিকে লোকজন নেই। অজ্ঞাতসারে আমার গায়েন শিউরে উঠল।

পাগলী তখনও বলে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অদ্ভুত ধরনের কথা!

—এক ধরনের অপদেবতা আছে, তন্ত্রে তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি ভয়ানকজীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া মায়া বলে পদার্থ নেই তাদের। পশুর মতোমন। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি। এরা যেন প্রেতলোকের বাঘ-ভালুক। ওদেরদিয়ে কাজ বেশি হয় বলে যাদের বেশি দুঃসাহস, এমন তান্ত্রিকেরা হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধহবার সাধনা করে। হলে খুবই ভালো, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়েযখন তখন খেলা করতে নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুঝিস্ নে, তাই রাগকরিস্!

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তাহলেহাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাকে আর প্রশ্ন করলাম না, বুঝলাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে না।কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। বললে— আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন। পাগলী ভয়ানক মানুষ, ওর মধ্যে এমন শক্তি আছে, আপনার একেবারে সর্বনাশ করে দিতে পারে। ওকে বেশি ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের কোন লোক ওর কাছেও ঘেঁষে না। বিদেশী লোক, মারা পড়বেন শেষে?

মনে ভাবলাম, কি আমার করবে, যা করবার তা করেছে। তার কাছে না গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তারপরে একদিন যা হল, তা বিশ্বাস করবেন না। একদিন সন্ধ্যের পরে পাগলীরকাছে গিয়েচি, কিন্তু এমনভাবে গিয়েচি পাগলী না টের পায়। পাগলীর সেই বটতলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটি ষোড়শী বালিকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের ভুল নয় মশায়, আমার তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপসা দেখবার কথা নয়, স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই তো! এ আবার কে এল? যাই কি না যাই?

দু-এক পা এগিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তিনি কোথায় গেলেন? মেয়েটি হেসে বললে, কে?

—সেই তিনি, এখানে থাকতেন!

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বললে—আ মরণ, কে তার নামটাই বল না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি?

আমি চমকে উঠলাম। সেই পাগলীই তো! সেই হাসি, সেই কথা বলবার ভঙ্গি।এই ষোড়শী বালিকার মধ্যে এই পাগলী রয়েচে লুকিয়ে! সে এক অদ্ভুত আকৃতি, ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ষোড়শী বালিকা।

মেয়েটি হেসে ঢলে পড়ে আর কি। বললে—এস না, ব'স না এসে পাশে—লজ্জা কি? আহা, আর অত লজ্জায় দরকার নেই। এস—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হল। মেয়েটির রকম-সকম আমার ভালো বলে মনে হল না—তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল এ পাগলীই, আমায় কোন বিপদে ফেলবার চেষ্টায়আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময়ে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম, দেখি, বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায়নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বললে—এস, ব'স।

বললাম—তুমি ও-রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলবখানা কি?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া, আবোল-তাবোল বকচে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলচি, আমায় কোন ভয় দেখিও না, যখন তোমায় মা বলে ডেকেচি।

পাগলী বললে—শোন তবে। তুই সে-রকম নস্। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক, তোকে দু-একটা কিছু দেব, তাতেই তুইকরে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। আসবে শিগ্‌গির অনেক মড়া, এই ঘাটেইআসবে। ততদিন অপেক্ষা কর্। কিন্তু যা বলে দেব, তাই করবি। রাজী আছিস। শবসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোন কালেই, তবুওকখনও মড়ার উপরে বসে সাধনা করব এ-কল্পনাও করিনি। কিন্তু রাজী হলামপাগলীর প্রস্তাবে। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিসের হাঙ্গামারমধ্যে যেন না পড়ি, আর সব তাতে রাজী আছি।

একদিন সন্ধ্যের কিছু আগে গিয়েচি। সেদিন দেখলাম পাগলীর ভাবটা যেন কেমনকেমন। ও আমায় বললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েচে, চুপি চুপি এস।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েচে। সেই জড়ানো পাকানো জলমগ্ন শেকড়ের মধ্যে একটা ষোল-সতেরো বছরেরমেয়ের মড়া বেধে আছে। কোন ঘাট থেকে ভেসে এসেচে বোধ হয়।

ও বললে, তোল্ মড়াটা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হালকা হবে। ওকে তুলে শেকড়ে রেখে দে, ভেসে না যায়।

তখন কি করছি জ্ঞান ছিল না। মড়ার পরনে তখনও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়েগিয়েচে শেকড়ের মধ্যে। আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হল না, অল্প চেষ্টাতেই সেটা টেনেতুলে ফেললাম।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর বসে তোকে সাধনা করতে হবে—ভয় পাবি নে তো? ভয় পেয়েচ কি মরেচ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করে উঠলাম। মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়েচে। সেদিনকার সেই ষোড়শী বালিকা। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, কোন তফাতনেই।

পাগলী বললে—চেঁচিয়ে মরচিস্ কেন, ও আপদ?

আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েচে তখন। পাগলীকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হল। মনে ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখচি। গাঁয়ের লোকেঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে সন্ধ্যেথেকে আমাকে তা করতে হল।

শবসাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয়। সন্ধের পর থেকেইআমি শবের ওপর আসন করে বসলাম। পাগলী একটা অর্থশূন্য মন্ত্র আমাকে বললে—সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয়নি যে, এতে কিছু হয়। এমন কি, ও যখন বললে—যদি কোন বিভীষিকা দেখ, তবে ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই মরবে।—তখনো আমার মনে বিশ্বাস হয়নি।

রাত্রি দুপুর হল ক্রমে। নির্জন শ্মশান, কেউ কোন দিকে নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকারেদিগ্‌বিদিক লুকিয়েচে। পাগলী যে কোথায় গেল, তাও আমি আর দেখিনি।

হঠাৎ একপাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে একটা কষাড় ঝোপের আড়ালে। শেয়ালের ডাক তো কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক শ্মশানে একটা টাটকা মড়ার ওপর বসে সেই শেয়ালের ডাকে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা-না-করা তোমার ইচ্ছে— কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে বলে আমার কোন স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা—তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না। সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল শ্মশানের নিচে নদীজল থেকে দলে দলে সব বৌ-মানুষরা উঠে আসচে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে ঘোমটা টানা, জল থেকেউঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো। দলে দলে—একটা, দুটো, পাঁচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করচি।ভাবচি—যা হয় হবে।

একটু পরে ভালো করে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চারপাশে একটাও বৌ নয়, সব কর্‌রা পাখি, বীরভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয়। দু-পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে ঠিক যেনমানুষের মতো।

এক মুহূর্তে মনটা হালকা হয়ে গেল—তাই বল। হরি হরি! পাখি!

চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষও হয়নি—পরক্ষণে আমার চারপাশে মেয়ে-গলায় কারা খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জমে গেল যেন। চেয়ে দেখি তখনএকটাও পাখি নয়, সবাই অল্পবয়সী বৌ। তারা তখন সবাই একযোগে ঘোমটা খুলেআমার দিকে চেয়ে আছে।...আর তাদের চারদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই, অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে, নিকটে, ডাইনে, বাঁয়ে, অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়েআছে। কত কালের পুরোনো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলো হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় রোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েচে, কোনটার মাথারখুলি ফুটো, কোনটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকেফেরানো—দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, কেউ যেন

তাদের বহু যত্নে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেচে। কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া করে রেখেচে, সে যেই ছেড়ে দেবে, অমনি কঙ্কালগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙাচোরা তোবড়ানো, নোনা-ধরা হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ শ্মশান থেকেপালাতে না পারি। হাড়েরা হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমার গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।

উঠে সোজা দৌড় দেব ভাবছি, এমন সময় দেখি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এ আবার কে? যা হোক, সব রকমব্যাপারের জন্যে আজ প্রস্তুত না হয়ে আর শবসাধনা করতে নামিনি। আমি কিছুবলবার আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে—আমি ষোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমায় তোমার পছন্দ হয় না?

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলীর কাছে, কিন্তু তাঁদের তো শুনেচি অনেক সাধনা করেও দেখা মেলে না, আর এত সহজে ইনি...বললাম—আমার মহাসৌভাগ্য যে আপনি এসেচেন...আমার জীবন ধন্য হল—

মেয়েটি বললে—তবে তুমি মহাডামরী সাধনা করচ কেন?

—আজ্ঞে, আমি তো জানি নে কোন্ সাধনা কি রকম। পাগলী আমায় যেমন বলে দিয়েচে, তেমনি করচি।

—বেশ, মহাডামরী সাধনা তুমিছাড়। ও মন্ত্র জপ কোরো না। যখন দেখা দিয়েচি তখন তোমার আর কিছুতে দরকার নেই। তুমি মহাডামরী ভৈরবীকে দেখনি—অতি বিকট তার চেহারা...তুমি ভয় পাবে। ছেড়ে দাও ও মন্ত্র।

সাহসে ভর করে বললাম—সাধনা করে আপনাদের আনতে হয় শুনেচি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন?

তোমার সন্দেহ হচ্ছে?

আমার মনে হল এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেচি, কিন্তু তখন আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েচে, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। বললাম—সন্দেহ নয়, কিন্তু বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েচি। আমি কিছুই জানি নে কে আপনারা।...যদি অপরাধ করি মাপ করুন, কিন্তু কথাটার জবাব যদি পাই—

বালিকা বললে—মহাডামরীকে চেন না? আমাকেও চেন না? তা হলে আর চিনেকাজ নেই। এসেচি কেন জিজ্ঞেস করচ? দিব্যৌঘ পথের নাম শোননি তন্ত্রে? পাষণ্ডদলনের জন্যে ঐ পথে আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমার মন্ত্রে দিব্যৌঘপথে সাড়া জেগেচে। তাই ছুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভালো বুঝতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম, তবে আমি কি খুবইপাষণ্ড?

বালিকা খিলখিল করে হেসে উঠল।

বললে তোমার বেলা এসেচি সম্প্রদায় রক্ষার জন্যে...অত ভয় কিসের? আমি নাতোকে লাথি মেরেচি? শ্মশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেচি। তোকে পরীক্ষা না করে কিসাধনার নিয়ম বলে দিয়েচি তোকে?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়েচি, বলে কি!

মেয়েটি আবার বললে—কিন্তু মহাডামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোর যেমন ভয়, সে তুই পারবি নে—ও ছেড়ে দে—

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

—ঠিক কথা দিলি?

—দিলাম। এ সময়ে যে-শবদেহের উপর বসে আছি, তার দিকে আমার নজরপড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্বশরীর কেমন হয়ে গেল।

শবদেহের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোন তফাত নেই। একই মুখ, একই রং, একই বয়েস।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখচিস্ কি?

আমি কথার কোন উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার মনেঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখেই প্রকাশ করে বললাম—কে আপনি? আপনি কি সেইশ্মশানের পাগলী নাকি?

একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিরে ফেঁড়ে চৌচির হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মাঠময় নরকঙ্কালগুলো হাড়ের হাতে তালি দিতে দিতে এঁকেবেঁকে উদ্দাম নৃত্য শুরুকরলে। আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। কোন কঙ্কালের হাত খসে গেল, কোনটার মেরুদণ্ড, কোনটার কপালের হাড়, কোনটার বুকের পাঁজরগুলো—তবুও তাদের নৃত্য সমানেই চলচে—এদিকে হাড়েররাশি উঁচু হয়ে উঠল, আর হাড়ে হাড়ে লেগে কি বীভৎস ঠক্‌ঠক্ শব্দ!

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত যেন জড়িয়ে গুটিয়ে গেল কাগজের মতো, আর সেই ছিদ্রপথে যেন এক বিকটমূর্তি নারী উন্মাদিনীর মতো আলুথালু বেশে নেমে আসচে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল, বিশ্রী মড়াপচার দুর্গন্ধে চারদিক পূর্ণ হল, পেছনের আকাশটা আগুনের মতো রাঙা-মেঘে ছেয়েগেল, তার নিচে চিল, শকুনি উড়চে সেই গভীর রাত্রে। শেয়ালের চিৎকার ও নরকঙ্কালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকি সব জগৎ নিস্তব্ধ, সৃষ্টি নিঝুম!

আমার গা-শিউরে উঠল আতঙ্কে। পিশাচীটা আমার দিকেই যেন ছুটে আসচে! তার আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলন্ত দু-চোখে ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রূপ মেশানো। সে কি ভীষণক্রূর দৃষ্টি! সে পূতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাক, সে আগুন-রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেইদৃষ্টিটা মিশে গিয়েচে একই উদ্দেশ্যে—সকলেই তারা আমায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতেচায়।

যে শবটার ওপর বসে আছি—সে শবটা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললে—আমায় উদ্ধার কর, রোজ রাত্রে এমনি হয়—আমায় খুন ক'রে মেরে ফেলেচে ব'লে আমার গতি হয়নি—আমায় উদ্ধার কর, কতকাল আছি এই শ্মশানে। ছাপ্পান্ন বছর...কাকেই বা বলি? কেউ দেখে না!

ভয়ে দিশেহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পুবে ফরসা হয়েএসেচে।

বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হলে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী বসে মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসচে...সেই বটতলায় আমি আর পাগলী দু-জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েচে। আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি না?

আমার শরীর তখনও ঝিমঝিম করচে।

বললুম—কিন্তু আমি ওদের দেখেচি। তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্রজপ ছেড়েদিলি। দূর, ওসব হাঁকিনীদের মায়া। ওরা সাধনার বাধা। তুই ষোড়শীকে চিনিস্ না, শ্রীষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি।

'এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাষোড়শী সুন্দরী।'

ক'হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রকট হন না। ক'হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা। তুই তারজানিস্ কি? ওসব মায়া।

আমি সন্দিগ্ধসুরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে! আরও একবিকটমূর্তি পিশাচীর মতো চেহারা নারী দেখেচি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না; তার পরেই মনে পড়ল, পাগলীর কথাও কি একটাতার সঙ্গে যেন হয়েছিল—কি সেটা?

পাগলী বললে, তোর ভাগ্য ভালো। শেষকালে যে বিকটমূর্তি মেয়ে দেখেছিস, তিনিমহাডামরী মহাভৈরবী—তুই তাঁর তেজ সহ্য করতে পারলি নে—আসন ছেড়ে ভাগলিকেন?

তারপর সে হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠে বললে—মুখপোড়া বাঁদর কোথাকার।উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের! আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস করি নে—হাঁকিনীদের নিয়ে কারবার করি। ওরে অলপ্পেয়ে, তোকে ভেল্কি দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে বসে আছিস বটতলায়। কোথায় গিয়েছিলি তুই? সকাল কোথায়, এখন যে সারারাত সাধনা করে আসন ছেড়ে এলি?এই তো সবে সন্ধ্যে—?

—অ্যাঁ!

আমার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক! সত্যিই তো সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়-হয়।আমার সব কথা মনে পড়ল। এসেচি ঠিক বিকেল ছ'টায়। আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা।মড়া ডাঙায় তোলা, শবসাধনা, নরকঙ্কাল, ষোড়শী, উড়ন্ত চিল-শকুনির ঝাঁক—সবআমার ভ্রম!

হতভম্বের মতো বললাম—কেন এমন ভোলালে? আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে?

পাগলী বললে তোকে বাজিয়ে নিচ্ছিলাম। তোর মধ্যে সে-জিনিস নেই, তোর কর্ম নয় তন্ত্রের সাধনা। তুই আর কোনদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেওআর দেখা পাবি নে।

বললাম, একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি তো অসাধারণ শক্তি ধরো, তুমি ভেল্কিনিয়ে থাক কেন? উচ্চতন্ত্রের সাধনা কর না কেন?

পাগলী এবার একটু গম্ভীর হ'ল। বললে—তুই সে বুঝবি নে। মহাষোড়শী, মহাডামরী, ত্রিপুরা—এঁরা মহাবিদ্যা। ব্রহ্মশক্তির নারীরূপ। এদের সাধনা এক জন্মে হয়না—আমার পূর্বজন্মও এমনি কেটেচে—এ-জন্মও গেল। গুরুর দেখা পেলাম না—যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব বকে কি করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশি দিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। আর যাইনি, ভয়েই যায়নি। পাগলীরদেখাও পাইনি আর কোনদিন।

তখন চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে হয় যে, পাগলী সাধারণমানবী নয়। সংসারের কেউ ছিল না সে, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্যে পাগল সেজে কেন যে চিরজন্ম শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত—তুমি আমি সামান্য মানুষে তারকি বুঝব? যাক সে-সব কথা। শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারিনি। ঠিকইবলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন এখনওকরতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও?এস চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙুলদিয়ে—

আমি দেখলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়াপড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাতত চন্দ্রদর্শন অপেক্ষাও গুরুতর কাজ বাকি।তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহার আমি কোনোজবাব দিব না।